উপনিবেশের উত্তরাধিকার: সেক্যুলার 'মুসলিম' জাতীয়তাবাদ

সাজ্জাদ জহির

বিগত শতাব্দীর শুরু থেকেই উপমহাদেশীয় মুসলিমদের আলিম এবং আওয়ামদের বিরাট এক অংশ মুসলিম নামধারী সেক্যুলারদের পেছনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, তাদের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে।

এটা কি কেবলই ফিকহি কিতাবের কোনো বিচ্ছিন্ন মাসআলার ভুল প্রয়োগ?

নাকি স্রেফ কোনো রাজনৈতিক ভুল?

শতবছর আগের রেশমী রুমাল আন্দোলনের পর থেকেই উলামায়ে কেরামের অংশবিশেষ ও ইসলামপন্থীদের অনেককেই আমরা দেখছি মুসলিম লীগ, কংগ্রেস বা এই ধরনের সেক্যুলার দলগুলোর অধীনস্থতা মেনে নিতে। এবং কোটি কোটি মুসলিমদের গণতান্ত্রিক মেহনতে মশগুল হবার আহ্বান জানাতে।

উপমহাদেশের মুসলিমদের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া "সেক্যুলার মুসলিম জাতীয়তাবাদ" নামক এই ভয়ংকর 'আদর্শিক' মারণব্যাধি ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের জঠর থেকেই উদগত। ইতিহাস ও বাস্তবতার আলোকে দেখা যায়, ৪৭ এর 'আজাদি' বা ৭১ এর 'মুক্তিযুদ্ধ' আমাদের স্বাধীন করেনি। বরং পরাধীনতার শেকল আরো মজবুতই করছে ক্রমান্বয়ে।

উপমহাদেশে নেতৃস্থানীয় উলামায়ে কেরাম এবং তালিবুল ইলমদের দিকে আলোকপাত করলে একথা নির্দ্বিধায় বলা সম্ভব যে, ইসলামের জন্য জীবন ও সম্পদ বিলিয়ে করে দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা আন্তরিক। একই কথা বিভিন্ন ইসলামি আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ও মধ্যম সারির নেতাদের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। আর আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

তবুও, কয়েকশ বছরের ইসলামি শাসন ব্রিটিশদের হাতে পতিত হওয়ার পর উপমহাদেশের মুসলিমরা ইসলামের ক্ষমতায়ন আজও ফিরিয়ে আনতে পারেনি। স্বল্পসংখ্যক ব্যতিক্রম ছাড়া সামগ্রিকভাবে মুসলিমদের আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনাও আজ নিম্নগামী। ইসলামের বদলে ইসলামের শত্রুদের উপকারেই মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটি জীবন বিলিয়ে দিচ্ছে। লক্ষ-কোটি আলিম-উলামা, তালিবে ইলম, দাঈ এবং ইসলামি আন্দোলনের নেতাকর্মীর উপস্থিতি ও সক্রিয়তা সত্ত্বেও, কেন উপমহাদেশে ইসলামের অধঃপতন অনিবার্য হয়ে উঠল?

সংক্ষেপে হলেও, এর কারণ ও উৎস যদি আমরা অনুসন্ধান না করি, তবে পরিস্থিতির উত্তরণ সম্ভব না।

এক কথায় বলতে গেলে মুসলিমদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে ব্যাপক বিপর্যয় ও নিরাপত্তাহীনতার অন্যতম কারণ হলো ইসলামের কর্তৃত্ব না থাকা। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্তরেও হস্তক্ষেপের ক্ষমতা লিবারেলিস্ট ও সেক্যুলারদের মতো ইসলামের শত্রুদের হাতে থাকা। মুসলিমদের মাঝে যারা ন্যূনতম জ্ঞান রাখে এবং যারা ইসলামের প্রতি আন্তরিক, তারা সকলেই এতে একমত।

মাদরাসা, খানকা, দাওয়াতের মারকাজগুলো, ওয়াজ-নসিহতের মঞ্চগুলো কিংবা বিভিন্ন ইসলামি রাজনৈতিক সংগঠনের তৎপরতা এই উপমহাদেশকে আন্দালুস বা বুখারা-সমরকন্দের মতো পরিণতি বরণ করা থেকে নিরাপদ রাখতে ভূমিকা রেখেছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এক্ষেত্রে সাধারণত দুইটি ভুল চিন্তার সন্নিবেশ ঘটে থাকে-

১. নিকৃষ্টতম অবস্থায় না পৌঁছানোকেই আদর্শ অবস্থা মনে করে, নিজেদের খেদমতকে ইসলামের জন্য পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি মনে করা। অর্থাৎ, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে নির্দিষ্ট কিছু দ্বীনি স্বাধীনতা থাকাকেই ইসলামি রাজনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য সাব্যস্ত করা।

২. অর্জিত সাফল্যকে কেবল বাহ্যিক প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং দরকষাকষির ফলাফল মনে করা।

আগ্রাসী শত্রু কোনো জাতির ওপর প্রবল হওয়ার পরও যদি বিপ্লব বা সশস্ত্র প্রতিরোধের আশঙ্কা থেকে যায়, তখন শত্রু বিভিন্ন শান্তিপূর্ণ চিন্তাধারা ও কর্মসূচীর মাঝে বিপ্লবী ধ্যানধারণাকে বেঁধে ফেলতে চায়। এটি ঐতিহাসিকভাবেই মুসলিম-অমুসলিম সব গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে।

শত্রুরা বিভিন্ন ইসলামি দলের প্রতি যে আপোষমূলক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে, তার একটা কারণ আছে। ঢালাওভাবে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামপন্থীদের নিশ্চিহ্ন করতে গেলে পাল্টা বিপ্লবের আশঙ্কা দেখা দেয়া।

আটশো বছরের মুসলিম শাসন এবং উলামায়ে কেরাম ও দাঈদের অক্লান্ত মেহনতের ফলে উপমহাদেশে প্রোথিত হয়ে যাওয়া ইসলামি মূল্যবোধ সমূলে উপড়ে ফেলা এখনো অসম্ভব। তবে, জাতীয় জীবনে গুরুত্বহীন সংস্কারমূলক কার্যক্রম চালু রাখা এক বিষয়; আর জমিনে কুফুরি শাসনের পতন ঘটিয়ে ইসলামের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।

যারা ইসলামি শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, তাদের জন্য এ বিষয়টি উপলব্ধি করা অত্যাবশ্যক। কেননা প্রতারণামূলক স্লোগান আর ধোঁয়াশাপূর্ণ কর্মসূচির মাধ্যমে সম্ভাবনাময় যুবক শ্রেণীর অনেকেই শরীয়াহ কায়েমের সংকল্প থাকা সত্ত্বেও ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে। যার ফলাফল হলো, প্রয়োজনীয় জনশক্তি, অর্থসম্পদ, ভৌগোলিক গভীরতা এবং বিভিন্ন উপকরণ থাকা সত্ত্বেও, আড়াইশো বছরেও উপমহাদেশে ইসলামি শাসন ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি।

فَلَنۡ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبۡدِیۡلًا ۚ وَ لَنۡ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحۡوِیۡلًا

> “কিন্তু আপনি আল্লাহর পদ্ধতিতে কখনো কোনো পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহর পদ্ধতির কোনো ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করবেন না।” (সূরা ফাতির, ৩৫:৪৩)

অর্থাৎ একথা সুনিশ্চিত যে, দুনিয়ার ব্যবস্থাপনায় আল্লাহ তা'আলার বিধান চিরন্তন ও অলঙ্ঘনীয়। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইতিহাসে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে বিভিন্ন জাতির উত্থান পতনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব, যে-কোনো রাষ্ট্রই সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে বিস্তার লাভ করেছে। আবার তাদের অধঃপতনও হয়েছে সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনেই। জাতিগোষ্ঠীর উত্থান-পতন ও অবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রয়েছে সুনির্ধারিত সূত্র। কবি ইকবাল বলেন,

> “আসো তোমাকে শোনাই জাতির উত্থান-পতনের সূত্র,
>
> শুরুতে তার তরবারি-তীর, শেষে শরাব-সেতার আর নৃত্য।”

তাই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোনো ঘটনা-দুর্ঘটনাই আকস্মিক বা বিচিত্র নয়, যতই আধুনিকতা বা “দুনিয়া বদলে যাওয়া”র যুক্তি দেয়া হোক না কেন।

শাইখ আবু মুসআব আস-সুরি যে-কোনো ইসলামি আন্দোলনের ব্যর্থতার মূল জায়গা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন দুটি বিষয়কে –

1) নেতৃত্বের দুর্বলতা এবং

2) ফিকির বা চিন্তার জগতে সংকট তৈরি হওয়া।

আবার, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফিকিরের সংকটের কারণেই নেতৃত্বের দুর্বলতা দেখা দেয়।

উপমহাদেশের মুসলিম শাসন অস্তমিত যাওয়ার পর তা আর উদিত না হওয়ার পেছনে ফিকিরের এই সংকট যথেষ্ট দায়ী। তাই, ইতিহাস থেকে আমাদের বোঝার চেষ্টা করা উচিত, আমাদের সমস্যার কেন্দ্র কোথায়। আমাদের চিন্তার জগতে অনুরণন তুলতে ইতিহাসের আয়নায় আমাদের নিজেদের প্রতিবিম্ব পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন, একাকী হলেও। কেননা, ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ সহজেই একজন আন্তরিক মুসলিমকে আগামীর কর্মসূচি নির্ধারণ করে দিতে পারে।

উপমহাদেশের মুসলিমদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, চিন্তাশীল ও আন্তরিক, শূন্যের ওপর শুরু করে পূর্ববর্তীদের কৃত ভুলসমূহের পুনরাবৃত্তি ঘটানো তাদের জন্য সঙ্গত নয়। বরং তারা পূর্ববর্তীদের ইতিহাসের আলোকে নিজেদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য যথাযথভাবে নির্ধারণ করবেন, সালাফদের পথ বেছে নেবেন এবং ব্যর্থদের পথ থেকে শত-সহস্র ক্রোশ দূরে থাকবেন। এমনটাই কাম্য।

???: ????? ?????????!

১৮৫৭ সাল। ১০০ বছর আগে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর ক্রমান্বয়ে বাংলা, উড়িষ্যা, আসামসহ ভারতবর্ষের বিস্তৃত অঞ্চলের ওপর শাসনকর্তৃত্ব লাভ করে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এর মাধ্যমে তারা ভারতবর্ষে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে। তখনো সামগ্রিকভাবে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতীক ছিলেন মুঘল শাসক বাহাদুর শাহ। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের পতন ঘটাতে বাহাদুর শাহকে সামনে রেখে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় ভারতবাসী। এতে অন্যতম প্রধান ভূমিকা রাখেন উলামায়ে কেরাম।

এর প্রেক্ষিতে প্রথমে অস্ত্রের মাধ্যমে, তারপর হিন্দুদের সাহায্যে মুসলিমদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব নষ্ট করতে সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে ইংরেজরা। বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যেগুলোর মধ্যে সর্বাগ্রে ভারতীয়দের রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতীক মুঘল বাদশাহর পতন ঘটানো। এজন্য ব্রিটিশরা সর্বশেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে বার্মায় নির্বাসনে পাঠায় এবং তার সন্তানদের নির্মমভাবে হত্যা করে। ছয়শো বছরের ইসলামি শাসনের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে যায়।

রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণে কোম্পানির নির্বাহী ক্ষমতা বিলুপ্ত করে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সরাসরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যা পরিচিতি লাভ করে "ব্রিটিশরাজ" নামে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর ব্রিটিশরাজ বুঝতে পারে শুধুমাত্র জোরপূর্বক দমনের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী শাসন সম্ভব নয়। হিন্দু রাজপুত, অভিজাত হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিম নামধারী কিছু দালালদের সহায়তায় ব্রিটিশরাজ উপমহাদেশে নিজেদের আইন-কানুন বাস্তবায়নে সক্ষম হয়।

১৮৫৭'র বিদ্রোহে ব্রিটিশ-হিন্দুত্ববাদী জোটের কাছে ইসলামি শাসনের স্বপ্নদ্রষ্টাদের সাময়িকভাবে পিছু হটতে হয়। আর ঠিক এসময়ই "মুসলমানদের পুনর্বাসন প্রকল্প" নিয়ে হাজির হন ইংরেজভৃত্য স্যার সৈয়দ আহমদ। সময়টা ছিল ইউরোপের 'এনলাইটেনমেন্ট' তথা মানবপূজার জয়জয়কার অবস্থা। লিবারেলিস্ট দার্শনিকদের (বিশেষত জন লকের) দীক্ষায় দীক্ষিত স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলিমদেরকে ইংরেজদের আধিপত্য মেনে নিয়ে এক অদ্ভুত চিন্তাচেতনার দিকে আহ্বান জানায়। মুসলিমদের আদর্শিক অধঃপতনের মূল কান্ডারী ছিল স্যার সৈয়দ আহমাদ খান ও আলীগড় আন্দোলনের অন্যান্য জমিদার নেতাগণ। এই গোষ্ঠীটির মাধ্যমেই মুসলিমদের মাঝে উদ্ভব ঘটে সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার।

মূলত এসব জালিমদের নিকট ইসলাম ছিল একটি প্রথা বা জাতিগত পরিচয়ের মাধ্যম মাত্র। তৎকালীন ইউরোপের রাজনৈতিক প্রভাব হারানো ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের মতো এসকল 'আশরাফ' মুসলমানরা ইসলামকে 'সেক্যুলার' চিন্তাধারার অনুগামী করতে আগ্রহী হয়। ইউরোপে খ্রিষ্টীয় শাসনের পতনের পর ধর্মনিরপেক্ষতা, বাকস্বাধীনতা, গণতন্ত্র বা জাতীয়তাবাদের নামে যে মানবপূজা শুরু হয়, মুসলিম ভূমিগুলোতে তা ছড়িয়ে পরে উপনিবেশবাদের কল্যাণে। এইসব চিন্তাধারার পেছনে ছিল প্রোটেস্ট্যান্ট তাত্ত্বিক আর ইউরোপীয় শাসকরা।

ফ্রান্স, ব্রিটেন প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো অস্ত্রের জোরে আলজেরিয়া, ফিলিস্তিন, সোমালিয়া, ভারতসহ বিভিন্ন ভূখন্ডে অর্থনৈতিক স্বার্থে উপনিবেশ স্থাপন করে। ঠিক তখনি এ ভূখণ্ডগুলোতে তারা নিজ আদর্শের বীজ বপন করেছিল। যাতে স্থানীয় জনগণকে

মানসিক দাসত্বের শেকল পড়িয়ে দীর্ঘদিন শোষণ করা সম্ভব হয়। এ কাজে সহায়তার জন্য প্রতিটি দেশেই কিছু স্বতঃস্ফূর্ত দালাল শ্রেণীকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো সাথে পেয়ে যায়। জনগণকে ধোঁকায় ফেলতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে, উপনিবেশবাদী শক্তিগুলো শাসনক্ষমতা ও রাষ্ট্রযন্ত্রে এসকল আদর্শিক দাসদের অংশীদার করতে শুরু করে। এসব দাসদেরকে তারা স্বীয় প্রভুদের শিক্ষায় দীক্ষিত হবার জন্য 'উচ্চশিক্ষা' লাভের সুযোগ করে দিত।

ব্রিটিশরা ১৮শ শতকে ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের অল্প সময় পরই স্থানীয় 'ইংরেজিশিক্ষিত' দালালের খোঁজে নেমে পরে। ইংরেজদের 'আবিস্কৃত' প্রথম সারির দালালদের অন্যতম ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ। যার প্রমাণ মেলে ১৮৫৭ সালের ইংরেজবিরোধী জিহাদের সময় তার ঘোর-বিরোধীতা থেকে। ইংরেজরা যেন মুসলমানদের সুযোগ-সুবিধা দানের মাধ্যমে ভবিষ্যতের যেকোনো বিদ্রোহ দমন করতে পারে, তার রূপকল্প পেশ করে স্যার সৈয়দ।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে ১৮৫৭-তে কেন বিদ্রোহ হয়েছিল, তার কারণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্রিটিশ রাজকে সাহায্য করতে তিনি পুস্তিকা রচনা করেন। তার এই বহুল প্রচলিত পুস্তিকা 'আসবাবে বাগাওয়াতে হিন্দ' নামে পরিচিত!

সেক্যুলারিজমের মন্ত্রে দীক্ষিত সৈয়দ আহমদ ও তার অনুসারীরা মুসলিমদেরকে ইসলামি শরীয়াহর ছত্রছায়ায় ফিরে যাওয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে ইংরেজদের অধীনে দুনিয়াবি উন্নতিকেই বেছে নেয়ার আহ্বান জানায়। ইংরেজদের নিরঙ্কুশ আনুগত্য মেনে তাদের সর্বাত্মক সহায়তার মাধ্যমে সরকারি চাকুরি লাভের জন্য মুসলিমদেরকে হিন্দুদের সাথে প্রতিযোগিতায় নামায়। যার এনামস্বরূপ ব্রিটিশ রানীর পক্ষ থেকে "নাইটহুড" খেতাব লাভ করতে সক্ষম হন সৈয়দ আহমদ। তার 'সুযোগ্য' পুত্র সৈয়দ মাহমুদ ইংরেজদের অধীনে প্রথম 'মুসলিম' হিসেবে ব্রিটিশ কুফুরী আইনে পরিচালিত কোর্টের বিচারপতি হওয়ার 'গৌরব' লাভ করে।

বদর উদ্দিন লুলু যেমন তাতারীদের আনুগত্য স্বীকার করে মসুলের আমির হওয়াকে গর্বের চোখে দেখেছিল, মীরজাফর যেমন ব্রিটিশ আনুগত্য স্বীকার করে বাংলার নবাব হওয়াকে নিজেদের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছিল, তেমনি সৈয়দ আহমদও ব্রিটিশদের শিকল গলায় পড়ে দুনিয়াবী উন্নতির দিকে ছুটে যাওয়াকেই মুসলিমদের প্রধান লক্ষ্য সাব্যস্ত করে। ইংরেজদের ছত্রছায়ায় ও প্রকাশ্য মদদে স্যার সৈয়দের এই চিন্তাধারা ব্যাপক আকার ধারণ করে। সরলমনা, নিপীড়িত মুসলিমদের দুনিয়াবি দুঃখ-কষ্ট দূরীকরণে উচ্চবিত্তের মনিব স্যার সৈয়দ, তার গড়ে তোলা আলীগড় আন্দোলন ও এর উত্তরসূরীদের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পাশাপাশি কলোনিগুলোতে স্থানীয় বিদ্রোহের ফলে সৃষ্ট চাপের মুখে উপনিবেশবাদীরা কলোনিগুলো ছেড়ে চলে যায়। যাওয়ার সময় তারা নিজেদের আদর্শিক দালালদের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করে দিয়ে যায়। যাতে এসকল রাষ্ট্রের থেকে সম্ভাব্য মুনাফা যেন হাসিল হতে থাকে।

তিউনিশিয়াতে ফ্রান্স তাদের একনিষ্ঠ ভক্ত হাবিব বুরগিবার হাতে স্বাধীনতার নামে শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করে যায়। ইন্দোনেশিয়াতে ডাচরা ক্ষমতাসীন করে যায় আহমদ সুকর্নকে। একইভাবে ব্রিটিশরাও তাদের ভাবশিষ্য জিন্নাহ, লিয়াকত, আগা খান, মৌলানা আজাদদের হাতেই উপমহাদেশের ক্ষমতা হস্তান্তর করে দিয়ে যায়। এরা সবাই ছিল উপনিবেশবাদীদের হাতে তৈরি আলিগড় আন্দোলনের ফসল। তবে জনগণকে ধোকায় ফেলতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবর্তে সেক্যুলারদের উত্তরসূরীরা ব্যাবহার করে "স্বরাজ", "আজাদি" বা "স্বাধীনতা"র মতো মুখরোচক বুলি। অথচ আনুষ্ঠানিকভাবে একে স্বাধীনতা নয়, 'ক্ষমতা হস্তান্তর' বলা হয়।

১৯৪৭ এর পর থেকে আলিগড়িদের উত্তরসূরীরাই হাল আমলের পাকিস্তানি পিএমএল, পিপিপি, ভারতীয় এমআইএম কিংবা বাংলাদেশি বিএনপি, জাতীয় পার্টির কর্ণধার; যারা কোটি কোটি মুসলিমের অন্তরে সেক্যুলারিজমের বিষ ঢেলে ইসলামের প্রত্যাবর্তনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

উপমহাদেশের মুসলিমরা যদি নিজেদের দ্বীন ও দুনিয়ার নিরাপত্তা আশা করে, তাহলে তাদের আলীগড়িদের চ্যালাপ্যালা, নব্য ব্রিটিশ ও বাকপটু সেক্যুলার নেতাদের পরিত্যাগ করতে হবে।

সঠিক মানহাজ ও নেতৃত্ব চিহ্নিত করা এবং অনুসরণ করা উম্মাহর জন্য অপরিহার্য।

[illegible]

আলীগড় আন্দোলনের পাশাপাশি রামমোহন রায়ের লিখনীর ফারসি অনুবাদ পড়ে উজ্জীবিত হয় স্যার সৈয়দ আহমদ। ফলে মুসলিমদেরকে ইসলামের অনুগামী করার পরিবর্তে, সেক্যুলারাইজ করতে কলম হাতে তুলে নেয়। মুসলিমদের 'ইংরেজি বাবু' বানানোর নিমিত্তে প্রতিষ্ঠিত হয় আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়। ইংরেজদের বিতাড়িত করে ইসলামি শাসন ফিরিয়ে আনার লক্ষ্য বদলে ফেলে আলীগড়। এর স্থলে, বাদামি চামড়া ইংরেজ হয়ে রুটি-রুজি অন্বেষণ আর কাফেরদের কাছে সম্মানিত হওয়ার দাওয়াত-ই ছিল আলীগড় আন্দোলনের মূল উপজীব্য। ইসলামের দাওয়াত ও পরিভাষাকে ব্রিটিশদের উপযোগী করে বিস্তর লেখালেখি, শিক্ষাপ্রদান ও কর্মতৎপরতায় লিপ্ত হয় আলীগড়ি লেখক-বুদ্ধিজীবিরা! যাদের মধ্যে মহসিনুল মূলক, ভিকারুল মূলক, সৈয়দ আমীর আলী, নবাব সলিমুল্লাহ খান প্রমুখ অন্যতম।

এই আলীগড় আন্দোলনের মাধ্যমেই মূলত মুসলিমদের মাঝে সেক্যুলার রাজনৈতিক চর্চার সূচনা। এই আন্দোলনের অগ্রগামী নেতারাই ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠা করে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'। সেক্যুলার চিন্তাধারায় প্রভাবিত এই দলটি আলীগড় আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রতিমূর্তি হিসেবে যাত্রা শুরু করে। এদের অন্য একটি দল হিন্দু প্রভাবিত কংগ্রেসে যোগদান করে। যার মাঝে ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, সেক্যুলার ধারণা লালনকারী এইসব লোকদেরকে মাওলানা উপাধি দেয় মূলত ফিরিঙ্গিরা।

মুসলিম লীগের শীর্ষ নেতারা ছিল স্যার সৈয়দের চিন্তা-চেতনার একনিষ্ঠ অনুসারী এবং সেক্যুলার। অনেকেই আবার স্যার সৈয়দের চেয়েও কট্টর সেক্যুলার ছিল। আবার কেউ কেউ ছিল পরিস্কার আল্লাহদ্রোহী কিংবা কাদিয়ানি। ইসলামের বিজয় বা শরীয়াহ শাসনের চিন্তা তাদের কল্পনাতেও ছিল না।

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে আলীগড় আন্দোলনের প্রভাবদুষ্ট ব্যক্তি, কট্টর সেক্যুলার ও ইংরেজপন্থী উচ্চশিক্ষিতরাই এই প্লাটফর্মে জড়ো হতে থাকে। ইংরেজদের মদদে একসময় মুসলিম লীগ নামক তথাকথিত 'মুসলিমপন্থী' দলটির শীর্ষস্থান পুরোপুরি বেদখল হয়ে যায়। যাদের মধ্যে রয়েছে ইংল্যান্ডে বেড়ে ওঠা ব্যারিস্টার ও শিয়া মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, ইংরেজদের আস্থাভাজন কাদিয়ানী জাফরুল্লাহ খান, তাগুত আগা খান প্রমুখ। পূর্ব বাংলায় তাদের উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিল—ব্রিটিশ আইনে দীক্ষিত একেএম ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, উগ্র-বামপন্থী আবুল হাশেম এবং অন্যান্যরা। অন্যদিকে পাঞ্জাবে ছিল সিকান্দার হায়াত খানের মতো ইংরেজবান্ধব সেক্যুলাররা।

সেক্যুলার চিন্তাধারার বিকাশে এবং প্রশাসনে ফিরিঙ্গি সেবাদাসের অভাব ঘোচাতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হিন্দুত্ববাদী অথবা আলীগড়ি সেক্যুলারদের হাতে চলে যায়। এই নামধারী মুসলিমরা ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থের ব্যাপারে ততটুকুই বলত, যতটুকু ব্রিটিশদের সাথে রাজনৈতিক দরকষাকষির ক্ষেত্রে কাজে দিত। আর, ব্রিটিশরাও তাদের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন দিতে কার্পণ্য করতো না। যাতে ইসলামের প্রকৃত নেতৃত্বের পরিবর্তে এই সকল আজ্ঞাবাহী প্রতারকদের অধীনেই মুসলিমদের সন্তুষ্ট রাখা যায়। দমন-পীড়ন-শোষণ সত্ত্বেও মর্যাদাবান এই জাতিটিকে যেন কপট নেতাদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। এই নেতারা যেন বিদ্রোহী না হয়ে ওঠে, তা নিশ্চিত করার জন্য ব্রিটিশরা তাদেরকে বিভিন্ন প্রশাসনিক সুবিধাও দিত।

সলিমুল্লাহ খান, লিয়াকত আলী খান, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, ফজলুল হক বা সোহরাওয়ার্দীর জীবনাচরণ ও চিন্তা-চেতনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এরা ছিল আগাগোড়াই ব্রিটিশ তরবিয়তে বেড়ে ওঠা সেক্যুলার। ইতিহাসের একজন সাধারণ ছাত্রের কাছেও এটা বেশ স্পষ্ট। আলীগড়ি মানসিকতায় ইসলামের মৌলিক কোনো ভূমিকা ছিল না। বরং ইসলাম ও মুসলিম শব্দ দুইটির মাধ্যমে তারা উপমহাদেশের প্রভাবশালী জনগোষ্ঠীকে নিজেদের লালসা পূরণে মুদ্রার মতো ব্যবহার করত।

১৯৩৫ সালে মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের অধীনে 'ভারত শাসন আইন-১৯৩৫' ঘোষিত হলে মুসলিম লীগ আশানুরূপ ফল পেতে ব্যর্থ হয়। ফলে চতুর জিন্নাহ ভারতের উলামায়ে কেরাম এবং পাঞ্জাব ও বাংলার সেক্যুলার নেতাদেরকে কাঙ্ক্ষিত শাসন ও কর্তৃত্ব দেওয়ার কথা বলে নিজের অধীনে আনতে সচেষ্ট হয়।

ঠিক যেন এ আয়াতের বাস্তব প্রতিফলন,

وَ يُرِيۡدُوۡنَ اَنۡ يَّتَّخِذُوۡا بَيۡنَ ذٰلِكَ سَبِيۡلًا

> "...আর তারা মাঝামাঝি একটা পথ অবলম্বন করতে চায়।" (সূরা নিসা, ৪:১৫০)

এর ফলে অদ্ভুতভাবে ইতিহাসের পাতায় উঠে যায়। জিন্নাহর অধীনে সেক্যুলার শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী, লিয়াকত আলি খান, আবুল হাশিম আর আগা খানদের প্ল্যাটফর্মে মুফতি শফি (রহ.), আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানি (রহ.) বা মাওলানা আতহার আলিদের একত্রিত হওয়ার মতো দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর জিন্নাহর কর্মকাণ্ড মুসলিমদের সাথে প্রতারণা আর সেক্যুলারদের সাথে ওয়াফাদারি হিসেবে প্রমাণিত হয়।

সমাজ ও রাষ্ট্রে নিগৃহিত হয় ইসলাম ও উলামায়ে কেরাম। পলিসি তৈরিতে শীর্ষস্থান লাভ করে কট্টর সেক্যুলাররা।

কবি ইকবালের ছেলে এবং পাকিস্তান হাইকোর্টের সিনিয়র বিচারপতি জাভেদ ইকবাল বলেন,

> "কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আগাগোড়াই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ছিলেন এবং ইসলামি রাষ্ট্রের চিন্তা তার কল্পনাতেও ছিল না।"

সংক্ষেপে এই হলো মুসলিম লীগ, তাদের অবিসংবাদিত নেতা ও তাদের লেগেসির বাস্তবতা। এদের নেতৃত্বেই ভারতের বিশাল অংশ হিন্দুদের হাতে ছেড়ে দিয়ে হলেও একটি ইসলামি রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এবং আজো যে সেই জিন্নাহপন্থীদের পেছনে দাঁড়ানোর জন্য ইসলামের মুহাফেজরা প্রতিযোগিতা করে থাকে! আজো তাদেরকে ইসলাম ও মুসলিমদের এক প্রতিরক্ষাব্যূহ মনে করা হয়। তাদের দেয়া হয় কায়েদে আজম, শেরে বাংলা, দেশনায়ক-সহ আরো নানা খেতাব!

১৯৪৭ এ সেক্যুলার মুসলিম লীগ এবং তার অনুসারী উলামায়ে কেরামের আহবানে সাড়া দেয় অনেক মুসলিম। ইসলামি সুশাসন ও নিরাপত্তার আশায় স্থানান্তরিত হতে গিয়ে নির্মমভাবে নিহত হয় পাঁচ লক্ষাধিক মুসলিম, ধর্ষিত হয় হাজার-হাজার নারী এবং বাস্তুহারা হয় এক কোটি মুসলমান। কিন্তু এর বিনিময়ে ইসলামি রাষ্ট্রের বদলে পূর্ব অংশে কায়েম হয়েছে ভারতের প্রভাব আর পশ্চিম অংশে কায়েম হয়েছে চীন আর আমেরিকার প্রভাব! শুধু নেই ইসলামের কোনো প্রভাব।

অথচ হতাশাজনকভাবে, আজো বহু মুসলমান জিন্নাহর উত্তরসূরী সেক্যুলারদেরকে ইসলামের খাদেম, ত্রাণকর্তা ভেবে থাকে। হ্যাঁ, এদের বাগ্মীতা, ব্যবস্থাপনার যোগ্যতা, সহনশীলতা বা বদান্যতার মত সহজাত নেতৃত্বের কিছু গুণ রয়েছে।

وَ جَعَلۡنٰهُمۡ اَئِمَّۃً يَّدۡعُوۡنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَ يَوۡمَ الۡقِيٰمَۃِ لَا يُنۡصَرُوۡنَ

> "আর আমি তাদেরকে নেতা বানিয়েছিলাম, তারা জাহান্নামের দিকে আহবান করত এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।" (সূরা আল-কাসাস, ২৮:৪১)

তাদের জানা রয়েছে ইসলামি পরিভাষা ও সরলমনা মুসলিমদের বশে আনার কায়দা-কানুন। একই সাথে রয়েছে মুসলিমদের সাথে বেঈমানির মাধ্যমে ফিরিঙ্গিদের কৃপাদৃষ্টি অর্জনের স্বভাব। জাহান্নামদের দিকে আহ্বানকারী এই সকল লোকদের বাস্তবতা আল্লাহ তা'আলা আগেই আমাদের জানিয়েছেন, যদিও আমরা তা থেকে গাফেল!

فَاِنۡ كَانَ لَكُمۡ فَتۡحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوۡۤا اَلَمۡ نَكُنۡ مَّعَكُمۡ ۫ۖ وَ اِنۡ كَانَ لِلۡكٰفِرِيۡنَ نَصِيۡبٌ ۙ قَالُوۡۤا اَلَمۡ نَسۡتَحۡوِذۡ عَلَيۡكُمۡ وَ نَمۡنَعۡكُمۡ مِّنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ؕ

> ".. অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি তোমাদের বিজয় হয় তবে তারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না'? আর যদি কাফিরদের আংশিক বিজয় হয়, তবে তারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের ওপর কর্তৃত্ব করিনি এবং

মুমিনদের কবল থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করিনি'?" (সূরা আন-নিসা, ০৪:১৪১)

আফসোস! সরলমনা মুসলিমরা বুঝতে চায় না যে, কাফির দার্শনিকদের তত্ত্ব পড়ে সম্মানিত বোধ করা সেক্যুলাররা কখনোই মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শাসনক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে মানতে প্রস্তুত নয়।

বর্তমানে মুসলিম জাতীয়তাবাদী স্লোগানের ফেনা তোলা রাজনৈতিক দলগুলো মূলত জিন্নাহ ও মুসলিম লীগেরই প্রেতাত্মা মাত্র! সময়ের ডানপন্থী দলগুলোর ও তাদের নেতাদের কেউই এর ব্যাতিক্রম নয়। তাই এক গর্তে বারবার পা দেয়ার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। ইসলামের শত্রুদেরকে বন্ধু না ভেবে, সঠিক আন্দোলন ও নেতৃত্বের পেছনেই জমা হতে হবে।

??????

ব্রিটিশরাজের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরুর পর হিন্দুরা দরকষাকষির মাধ্যমে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আদায়ে তৎপর হতে থাকে। ১৮৮৫ সালে তারা গঠন করে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' নামক রাজনৈতিক সংগঠন।

ইংরেজ গভর্নরদের আশীর্বাদপুষ্ট এই দলটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল অনেকটা এনজিও'র মতো। এরা জনসাধারণের বিভিন্ন সমস্যা ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছে তুলে ধরতো। উপমহাদেশের জনসাধারণকে মায়াজালের ফেলে রাখতে ব্রিটিশরা হিন্দু-মুসলিম ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের সমন্বয়ে 'সাম্রাজ্যবাদী আইনসভা' গঠন করে। কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দকেই সেখানে জায়গা দেওয়া হয়। স্যার সৈয়দ আহমাদও এই সংঘের অন্যতম সদস্য ছিলেন। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দ্রুত শক্তিশালী হওয়া গান্ধী, নেহরু, প্যাটেল প্রভাবিত কংগ্রেস ব্রিটিশদের সাথে দরকষাকষির অন্যতম প্ল্যাটফর্ম হয়ে দাঁড়ায়।

১৯১৮-এ রুলেট এক্টের মাধ্যমে ব্রিটিশদের যে-কোনো ধরনের সমালোচনার মুখ বন্ধ করার বন্দোবস্ত করা হয়। বিনা ওজরে ঢালাও গ্রেফতার ও দমন-পীড়নের ফলে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে উঠে। বিরোধীপক্ষের মধ্যে ব্রিটিশদের জন্য সবচেয়ে কম ক্ষতিকর এবং সবচেয়ে আপোষকামী দুটি দল ছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ। এমনকি এক মেয়াদে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট থাকা সুভাষ বসুও কংগ্রেসের আপোষকামী অবস্থানের বিরুদ্ধে অবস্থানগ্রহণ করেন।

রুলেট এক্টের পরপর শুরু হওয়া 'খেলাফত আন্দোলন' গান্ধীর সাথে মুসলিম নেতাদের কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ করে দেয়। এসময়ই আলীগড়িদের একাংশ 'মুসলিম পরিচয়ে দুনিয়াবী সুবিধা আদায়'-এর উদ্দেশ্যে কংগ্রেসে যোগ দেয়। তন্মধ্যে মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ অন্যতম। নামের শুরুতে মাওলানা উপাধি যোগ করা হলেও তারা আগাগোড়াই ছিলেন সেক্যুলার চিন্তাধারার ধারক। ইসলামি শাসনের পুনরুত্থান বা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোনো চিন্তা তাদের ছিল না। বরং কাফের কিংবা হিন্দুদের অধীনে থেকে হলেও বৈষয়িক সুবিধা হাসিলে বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ব্যবহারই ছিল এদের উদ্দেশ্য। ঠিক যেমনটা ছিল মুসলিম লীগের নেতৃত্বেরও।

কংগ্রেসের অধীনস্ত সেক্যুলার নেতাদের ইসলামবিরোধী কর্মকান্ড বা হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ নীরবতা, উপমহাদেশে ইসলামের প্রভাব ব্যাপকভাবে নষ্ট করেছে। পাশাপাশি কংগ্রেসের 'মুসলিম' নামধারী সেক্যুলার নেতৃবৃন্দ ইসলামের তুলনায় ভারতীয় স্বার্থের কথাই অধিক আলোচনা করেছে। এটা ছিল ভিন্ন মাত্রার অন্য আরেক ক্ষতি।

মুসলিম লীগ বা কংগ্রেসের মুসলিম নামধারী নেতারা ছিল সেক্যুলার। শরীয়াহ শাসন ফিরিয়ে আনার কোনো লক্ষ্য বা কর্মসূচি তাদের ছিল না। ইসলামের কথা তাদের মুখে আসতো সরলমনা মুসলিমদের সমর্থন অর্জনের জন্য। যাতে উলামায়ে কেরাম ও মুসলিম জনগোষ্ঠীকে দরকষাকষির মাধ্যম বানিয়ে ক্ষমতা অর্জনের দৌড়ে এগিয়ে যাওয়া যায়।

মনে রাখা দরকার, মুসলিম লীগ আর কংগ্রেসের মুসলিম নেতাদের মাঝে যে মতপার্থক্য, তা কেবলই দুনিয়াবি বিভিন্ন পলিসিকেন্দ্রিক। মৌলিকভাবে তারা ছিল এক ও অভিন্ন। তাদের পার্থক্যের মূল জায়গা শুধু এটাই যে,

- কংগ্রেসপন্থী মুসলিম নামধারীরা প্রাদেশিক ক্ষমতায়ন, আইনসভা ও প্রশাসনে আনুপাতিক হারে প্রভাব লাভের বিনিময়ে হিন্দুদের নেতৃত্ব মেনেই অখন্ড ভারতের দাবি আদায়ের পক্ষ নিয়েছিল।

- আর মুসলিম লীগের বক্তব্য ছিল, হিন্দুদের অধীনে পর্যাপ্ত ক্ষমতা ও প্রশাসনিক সুবিধা অর্জন সম্ভব নয়। তাই বিশাল ভূখণ্ড হিন্দুদের হাতে ছেড়ে দিয়ে হলেও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো নিয়ে আলাদা রাষ্ট্র গঠন করা প্রয়োজন।

লক্ষ্য করুন, উভয় ক্ষেত্রেই এসব নামধারীদের মূল লক্ষ্য ছিল, ক্ষমতা চর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। ইসলামি শাসনব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার কোনো চিন্তা তাদের ছিল না। কিন্তু এই সেক্যুলার নেতা ও দলগুলো সরলমনা মুসলিম জনগণকে ধোঁকা দিতে সক্ষম হয়। কখনো হিন্দু ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের অধিকার আদায়ের দাবি তুলে, কখনো হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় সোচ্চার হয়, কখনো উর্দু ভাষা রাষ্ট্রীয়করণের আন্দোলনের মতো কর্মসূচী দেয় তারা। এর মাধ্যমে নিজেদেরকে ‘মুসলিমবান্ধব’ প্রমাণ করতে তারা ভালোভাবেই সফল হয়। উলামায়ে কেরাম ও সাধারণ মুসলিম জনতার সামনে মুখরোচক আলোচনা ছাড়া, ইসলামের পক্ষে বাস্তব কোনো ভূমিকা তাদের ছিল না। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রের কিছু কিছু অংশে ইসলামের ভূমিকা তাদের কেউ কেউ স্বীকার করলেও, রাষ্ট্রের পরিচালনার প্রশ্নে তারা তা প্রত্যাখান করতো। ইতিহাস এমনটাই সাক্ষ্য দেয়।

অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসের সর্বকনিষ্ঠ সভাপতি, স্বাধীনতার দাবিদার, তথাকথিত মুসলিম নেতা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন,

> “যদি আজ আসমান থেকে কোনো ফেরেশতা কুতুব মিনারের ওপর নাযিল হয়ে বলে, হিন্দু-মুসলিম একতা ত্যাগ করা হলে, ২৪ ঘন্টার মধ্যে ভারত স্বাধীনতা/স্বরাজ অর্জন করবে; তবে আমি স্বাধীনতা/স্বরাজ ত্যাগ করতে রাজি আছি কিন্তু হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ছাড়তে রাজি নই!”

পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা, মুসলিম লীগের নেতা মুহাম্মাদ আলি জিন্নাহর সেক্যুলার চিন্তার বহিঃপ্রকাশ দেখুন:

> “রাজনীতিতে ধর্মের প্রবেশ কাম্য নয়। ধর্ম তো স্রেফ মানুষ আর খোদার মধ্যকার একটি বিষয়!”[1]

> “... মানবতার দাবিতে আমি মুসলিমদের চেয়েও বেশী শুদ্রদের প্রতি বেশী আন্তরিক।”[2]

> “বিশ্বাস করুন, যখন আমি পাকিস্তানের দাবি জানাচ্ছি এর মানে এই নয় যে আমি মুসলিমদের জন্য লড়াই করছি।”[3]

> “ভুল বুঝবেন না। পাকিস্তান কোনো থিওক্রেসি (ধর্মীয় রাষ্ট্র) বা অনুরূপ কিছু নয়।”[4]

সুতরাং উপলব্ধি প্রয়োজন। আপনার মুসলিম পরিচয় নিয়ে সেক্যুলার নেতাদের কোনো এলার্জি নেই! মুসলিমদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান কিংবা নিরাপত্তা দিতেও সেক্যুলারদের কোনো সমস্যা নেই। সেক্যুলারদের একমাত্র সমস্যা হচ্ছে সকল ক্ষেত্রে ইসলামি শরীয়াহর পূর্ণ কর্তৃত্ব। ইসলামের মৌলিক কোনো শিক্ষা যদি প্রবৃত্তিপূজার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তবে তারা সেটাকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেয়। মানবতার শত্রু সেক্যুলারদের এই হীন বাস্তবতাটি তৎকালীন ও বর্তমান মুসলিমদের বড় অংশ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে খোদ সেক্যুলারদের ভাষ্য লক্ষ্য করা যাক। আমেরিকার ‘স্কুল অব সিকিউরিটি অ্যান্ড গ্লোবাল স্টাডিস’ এর শিক্ষক, সেক্যুলার ও বামপন্থী লেখক সাইদ ইফতিখার আহমদ লিখেন,

> “সেক্যুলার রাষ্ট্রের মূল বিষয়টা হল রাষ্ট্র ধর্মমত নির্বিশেষে সকল নাগরিকের ধর্ম পালনের সমান সুযোগ নিশ্চিত করবে। সকল ধর্মকেই রাষ্ট্র সমান ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করবে। রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মের পরিচয়ে পরিচিত হবে না বা শুধু কোনো একটি ধর্মকে পৃষ্ঠপোষণ করবে না। আবার কেউ যদি কোনো ধর্ম পালন করতে না চায়, সেক্যুলার রাষ্ট্রে তার সে স্বাধীনতাও থাকবে। রাষ্ট্র তাকে কোনো বিশেষ ধর্ম পালনে বাধ্য করবে না। সেক্যুলার

রাষ্ট্রে কোনো ব্যক্তির ধর্ম পরিচয় তার চাকরি, ব্যবসা বাণিজ্য বা রাজনীতি করবার অধিকারে প্রতিবন্ধক হবে না।

উদাহারণস্বরূপ বলা যায়, সেক্যুলার রাষ্ট্রে কোনো সরকারি অফিসে কেউ চাইলে যেমন নামাজ আদায় বা মিলাদের আয়োজন করতে পারবেন। আবার অন্য ধর্মাবলম্বীরা চাইলে তাদের ধর্মের বিধি অনুযায়ী প্রার্থনা করতে পারবেন। প্রার্থনা করবার বা না-করবার বিষয়ে সবার সমান স্বাধীনতা এবং অধিকার থাকবে।

বাম সংগঠনের নেতাকর্মীরা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে সব ধর্মের মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে সেক্যুলার রাষ্ট্র গড়ার সংগ্রামে রত আছেন। সকল মানুষের ধর্ম পালনের সমান স্বাধীনতা নিশ্চিত করবার জন্য তারা ১৯৪৭ সাল থেকে লড়াই করে আসছেন।

এখন এ লড়াইয়ে তারা কতটা আন্তরিক সেটা নির্ভর করছে তাদের নেতাকর্মীদের নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্ম পালনের স্বাধীনতা বা পরিবেশ তাঁরা নিশ্চিত করতে পারছেন কি না, তার ওপর। আগামী দিনের সেক্যুলার বাংলাদেশ গড়ার লড়াইয়ে তাঁদের ভূমিকা—এ বিষয়টার সাথে যুক্ত।”

আবারও বলছি, মুসলিম লীগ আর কংগ্রেসের ‘মুসলিম’ নেতাদের চিন্তাধারার ফলেই ব্রিটিশরাজের অধীনস্থ বেতনভোগী সরকারি চাকরিজীবী ও রাজনীতিবিদগণের আবির্ভাব ঘটে। বর্তমানেও এইসব ‘সেক্যুলার’ চিন্তাচেতনার রাজনীতিবিদ ও আমলারা আজো ঔপনিবেশিক আইন-কানুন ও সংস্কৃতির মুহাফেজ হয়ে জাতির ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে আছে।

আফসোসের বিষয়, ২০০ বছরের নিষ্পেষণ সত্ত্বেও মুসলিমদের বড় অংশটি উপনিবেশবাদের উত্তরাধিকারী সেক্যুলারদের চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়নি। তবে শরীয়াহ ও বাস্তবতার গভীর জ্ঞান লালনকারী উলামায়ে কেরামের চিন্তাও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে,

সেক্যুলার চিন্তা-চেতনা পোষণকারী এবং রাষ্ট্রপরিচালনায় শরীয়াহ শাসনকে অপরিহার্য মনে না করে ব্রিটিশ কানুনকে আঁকড়ে ধরা ব্যক্তিবর্গ যতই নিজেদের ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে সম্পৃক্ত করুক না কেন, তারা কুফরীর উপরে রয়েছে।

দরবারি কিংবা রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, সাংবিধান ও বিচার-কাঠামো সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যতীত এ বিষয়টি অস্পষ্ট থাকার কথা নয়।

১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরও, ব্রিটিশ-প্রণীত পূর্বের সংবিধান, প্রশাসনিক কাঠামো এবং নিরাপত্তা বাহিনীর গঠন অবিকৃত থেকেই দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভেঙ্গে সৃষ্ট হওয়া বাংলাদেশেও একই অবস্থা চলমান রয়েছে। কিন্তু এই ব্যাপারে আমরা বেখবর।

২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের বিষয়ে মুসলিমরা কিছুটা সচেতন হলেও, পরবর্তী বাদামি চামড়ার ব্রিটিশ শাসনের ব্যাপারে আজও তারা উদাসীন। এর পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক নেতাদের চাতুর্যপূর্ণ বক্তব্য, পত্রপত্রিকা ও মিডিয়ার প্রোপাগান্ডা, জ্ঞানীদের ভুল ধারণা ও দমন-পীড়ন। এর ফলে উপমহাদেশ আজো আদল এবং ইনসাফের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত। এই নিয়ামতের স্বাদ সুদীর্ঘ ৮০০ বছর ধরে পরিচালিত মুসলিম শাসনের অধীনে উপমহাদেশের সকল মানুষ আস্বাদন করেছিল।

ইসলামের শাসন পুনরুদ্ধারে মুসলিম ও তাদের বাতিঘর উলামায়ে কেরামের জন্য চলমান সমস্যাকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা অপরিহার্য। আর এই আদি সমস্যাটি হচ্ছে, ইউরোপের ঔরসে জন্ম নেয়া বিষাক্ত মতবাদ ‘সেক্যুলারিজম’ ও গণতন্ত্রের শাসন। উপমহাদেশে এটা চাপিয়ে দিয়েছিল সাদা চামড়ার ফিরিঙ্গিরা। আর বর্তমানের শাসকগোষ্ঠী, আমলাতন্ত্র, মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবিরা মূলত তাদেরই একনিষ্ঠ উত্তরসূরী। যদিও তাদের চামড়ার রঙ, অবস্থান বা জন্মস্থান ব্রিটিশদের চেয়ে আলাদা।

---

[1] Jinnah, Address to the Central Legislative Assembly, 7 February 1935

[2] Jinnah, Speaking about the Shudras or Untouchables, during his address at the All India Muslim League session at Delhi, 1934

[3] Jinnah, Press Conference, 14 November 1946

[4] Jinnah, Message to the people of Australia, 19 February 1948